OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 56
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 474 - 481
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 474 - 481
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

লোক দেবতার সন্ধান ও বিবর্তন

পল্লবী সরদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিকম স্কীলস্ ইউনিভার্সিটি, শান্তিনিকেতন
Email ID: pallavisardar911@gmail.com
0009-0008-6101-1033

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Supernatural beings, matriarchal society, patriarchal society, natural forces, Turkish invasion, Mangalkavya, upper caste class, Kaulina system, untouchability, lower caste Hindus.

Abstract

Since ancient times, a social harmony centered on worldly gods and goddesses has developed in various worship festivals and religious rituals. Our ancestors used to draw pictures of possible animals on the walls of caves before going hunting and pierce them with arrows. They believed that by doing this, the imaginary object would become real and an afterlife would help them achieve their goals. When they hunted the desired animal, they would sacrifice some part of the animal's body to that afterlife and then they themselves would consume it as food, because the main goal of primitive society was to survive and survive in the face of natural adversity, the first task was to ensure food supply; therefore, in their struggle for existence, such activities carried a kind of black magic. In addition, they believed that there was a supernatural being behind every natural phenomenon. At that time, since a sense of reason was hidden in people, they imagined the presence of a spirit in everything, like themselves. This idea began with the appearance of an invisible entity that controls our destiny from behind, that is, the emergence of gods/ goddesses.

Gradually, as society developed, the socio-economic infrastructure also changed, and towards the end of the Paleolithic era, signs of female idols were also found along with the development of matriarchal societies. In changing times, matriarchal societies also changed, in the socio-economic context, the first level was animal hunting and fruit gathering, and the second level was agriculture and building dwellings. Therefore, the difference in the work of boys and girls developed in the same way, and the concept of gods also developed in the same way, with male gods as well as female gods gaining prominence. A patriarchal society began.

The Middle Ages began with the Turkish invasions and Muslim rule of the 12th century, the nature of the discrimination that arose around the gods during this time, the discrimination between the upper and lower classes, has been discussed in detail in the main article. Also, the emergence of caste-centric deities like Dakshinaray, Kaluray, Banabibi, Narayani, Olaichandi, Manikpir, Dharmathakur, Pir Gorachand etc., which were worshipped by the

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 56
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 474 - 481
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

lower caste people, later found coexistence and harmony among the deities of the caste Hindus.

The entire article discusses the underlying perspective of maintaining social respect and self-respect during the changes and transformations of the greatness of these deities from ancient times to the present.

Discussion

লৌকিক দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে পূজা পার্বণ ও ধর্মীয় সংস্কারে যে সামাজিক সমন্বয় গড়ে উঠেছিল তার নেপথ্য ভাবনা ও মধ্যযুগ থেকে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে দেবতা কেন্দ্রিক যে শ্রেণী বৈষম্য তৈরি হয়েছিল তার অন্তর্নিহিত কারণ অনুধাবন। বিশেষত বর্ণাশ্রমকেন্দ্রিক যে সকল দেবতাদের উদ্ভব ঘটেছিল, যেমন - দাক্ষিনরায়, বনবিবি, মানিকপির, সত্যপীর-সত্যনারায়ন, চণ্ডী, মনসা প্রমুখ নিম্নবর্ণীয়দের দ্বারা পুজিত দেব-দেবীরা পরিবর্তিত সময় বর্ণহিন্দুদের দেবকুলে নিজেদের স্থান গড়ে তলার পিছনে যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবনা কাজ করেছিল সে বিষয় আলোচ্য প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে এই সকল দেব-দেবীরা তাদের মাহাত্ম্যের পরিবর্তন ও রূপান্তরিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রেক্ষাপট আলোচনামালায় বর্ণিত হয়েছে।

প্রাচীন যুগে হিন্দু দেবতাকূলে শ্রেণী বৈষম্যের স্বরূপ সন্ধান :

আমাদের ধর্মবোধের সঙ্গে দেবদেবীর সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ভারতবর্ষে ধর্মের ইতিহাসে এই দেব-দেবীর ধারণা খুবই প্রাচীন। এই সকল দেবদেবীর পূজার্চনায় যে সকল প্রথা, বিধি, আচার, সংস্কার মেনে চলেন বিশ্বাসীরা, সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছিল স্মরনাতীত সুপ্রাচীনকালের বহুবিধ ব্যবহারিক অনিবার্যতা এবং জীবনযাত্রার জন্য বা বলা যেতে পারে বাস্তব প্রয়োজন মেটাতে। তবে শুধুমাত্র প্রয়োজনের তাগিদ নয়, এ সমস্ত পূজার মধ্যে জড়িয়ে আছে মানুষের অন্তরের অনুভূতি ও আন্তরিকতা। এই সকল প্রথা, আচার-বিধি ইত্যাদি তৈরি করেছিলেন আমাদের প্রাচীন প্রপিতামহরা। হিন্দু ধর্মে প্রাচীনকাল থেকেই পূজার্চনায় বিশেষ বিশেষ উপকরণ, ফুল অঞ্জলি মন্ত্র পশুবলি ইত্যাদির ব্যবহার হয়ে আসছে। মানুষ সাধারণ অর্থে দেবদেবী বলতে সেই অলৌকিক শক্তির অধিকারীদের বোঝে যাঁরা মূলত মর্তলোকের সুখ-দুঃখ, সাংসারিক নানাবিধ টানাপড়িন তথা যা কিছু জাগতিক যন্ত্রণার উপশম ঘটাতে সহায়তা করে। ফলত তাঁদের পূজার মাধ্যমে সন্তুষ্ট করা হয় অপার্থিব এক মহা সুখের অন্বেষণের তাড়নায়।

প্রাচীনকালে আমাদের প্রপিতামহরা দল গুহার দেওয়ালে শিকারের দৃশ্যাবলী এঁকে রাখতেন; অঙ্কিত ছবির উপর তীর বেঁধা থাকতো - এরূপ ঘটনার কারণ যাদুবিশ্বাস বা অলৌকিক কোনো শক্তির প্রতি নির্ভরতাবশত কল্পিত সত্তার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানানো। তারা বিশ্বাস করতেন এতে তাঁদের শিকার ভালো হবে এবং শিকার করার পর তারা তাঁদের কল্পিত সত্তা বা দেবতার উদ্দেশ্যে সেই পশুর দেহের মাথা বা পাঁজর নিবেদন করতেন। আকাশ, মাটি, বৃষ্টি, আলো, হাওয়া, গাছ, পাহাড়, বন, মাছ প্রভৃতির যাবতীয় নিসর্গবস্তু এবং নৈসর্গিক ঘটনার অন্তরালে লুকিয়ে থাকে একটা না একটা অলক্ষ্য শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠে নিজের অস্তিত্বের জানান দেয় এমনটাই ধারণা ছিল আদিম মানুষের। নৃবিজ্ঞানীদের ভাষায় এরূপ সংস্কারকে মান্যা বলা হয়।[১]

ক্রমবিকশিত সমাজ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেবতা ও ধর্মের সমন্বয় গড়ে উঠেছে সমাজ পরিস্থিতি অনুযায়ী। প্রাচীন সমাজ ছিল মাতৃকেন্দ্রিক, সমাজের নির্দিষ্ট নিয়ম বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি তখনও মানুষের অবগত ছিল না। মাতৃপরিচয় ছিল সেই সময় একমাত্র নির্দিষ্ট এবং পিতৃ পরিচয় অনিশ্চয়তার দরুন তৎকালীন আদিমতম সমাজে ধর্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছিল মূলত মাতৃকা উপাসনার মাধ্যমে। এরূপ ঘটনার নিদর্শন পাওয়া যায় প্রত্ন-প্রস্তর যুগের শেষ পর্বে মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপে, উত্তর আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া প্রভৃতি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মাতৃকা পূজা নিদর্শন মেলে। তৎকালীন সমাজ বিবর্তনে যেহেতু মায়ের গুরুত্ব ও ভূমিকা একমাত্র অবলম্বনের পন্থা ছিল তাই ধর্মীয় বিশ্বাসে ও মাতৃকা আরাধনায় নারী-দেবতার আবির্ভাব

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 56
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 474 - 481
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ঘটেছিল। সকল সমাজ ব্যবস্থার মূল কাঠামোই নির্ভর করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর, যতদিন সমাজে মায়ের প্রাধান্য ছিল ততদিন সেখানে আর্থ-সামাজিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত মা-ই ছিল।

প্রকৃতপক্ষে যেকোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে খাদ্য উৎপাদন পদ্ধতির লব্ধ ফল হিসেবে। প্রাচীন আদিম সমাজে খাদ্য সংগ্রহের হত পশু শিকার ও ফলমূল জোগানের মধ্যে দিয়ে। শারীরিকভাবে বলিষ্ঠ হওয়ার জন্য পুরুষের প্রধান কাজ হয়ে উঠল শিকার সংগ্রহ করা, এবং ফলমূল সংগ্রহ করাটা মেয়েদের কাজের অন্তর্ভুক্ত হল। খাদ্যের বৃহত্তর যোগানটা যেহেতু শিকার থেকে আসতো সেজন্য পুরুষ প্রাধান্য ধীরে ধীরে সূচিত হতে লাগল। ধর্মের চিরাচরিত নিয়মের পরিবর্তন ঘটলো; মাতৃকা উপাসনার পাশাপাশি পুরুষ দেবতারও কল্পনা করতে শুরু করল আদিম মানুষ।

শিকারজীবী ও সংগ্রহকারী স্তর থেকে মানুষের উৎপাদন প্রক্রিয়া ক্রমে উন্নততর হয়ে হল পশুপালন ও কৃষিকর্ম পর্যায়। সমাজের অর্থনীতি গড়ে উঠলো কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে। ফলে এই পরিবর্তনের প্রভাব গিয়ে পড়লে ধর্মবিশ্বাসের উপর, আদিম মাতৃকা তন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হল নতুন ভাবনা – উর্বরতা তন্ত্র বা fertility cult এর ধারণা। পৃথিবী (ধরিত্রী) ও নারী সমার্থবোধক ধারণাটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে লাগল সমাজ মানুষে। শস্য কামনা তথা শস্য উৎপাদন ও সন্তান কামনার বিষয়টি একই ছকে অঙ্কিত হল, সমধর্মী হিসেবে। এর ফলে সমাজের ভাগ্য নিয়ন্তা গোষ্ঠীদের মাথায় হাত পড়ল, কারণ কৃষি আবিষ্কারের ফলে আদি সাম্যাশ্রিত সমাজের পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে ততদিনে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির চিন্তা ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ক্রমে, সেই সঙ্গে সঙ্গে উৎপত্তি ঘটেছে শ্রেণীবিভক্ত সমাজেরও। উর্বরতা কেন্দ্রিক ধর্ম চেতনা যেমন উৎপাদন পদ্ধতি রূপে কৃষি কাজের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছে ঠিক তেমনি দেবতা কল্পনায়ও খানিক অদল-বদল ঘটেছে। উদ্বৃত ফসল ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী হিসেবে একটি সুবিধাভোগী শ্রেণির সৃষ্টি হল, একই রকম ভাবে সেই ছকেই দেবতা কল্পনাতেও মুখ্য ও গৌণ দেবতা রূপে দুটি পৃথক শ্রেণী গড়ে ওঠে। ওই চিন্তা-চেতনাকে অবলম্বন করে নানা সংস্কৃতিতে দেবরাজ ইন্দ্র, জিউস প্রমুখ ও দেবতার আবির্ভাব ঘটে।

পশুচারণজীবী সমাজে পুরুষের প্রাধান্য বেশি থাকায় তাদের দেবতা কল্পনায় পুরুষ প্রাধান্য পেত। বৈদিক আর্যভাষী পশুচারণজীবীদের আদি গ্রন্থ ঋকবেদে দু-চারজন ছাড়া সকলেই তাই পুরুষ দেবতা - ইন্দ্র, সূর্য, বরুণ, সোম, পুষণ প্রমূখ। ব্যতিক্রম শুধু উষা।

ক্রমে মানুষ পরবর্তী স্তরে কল্পনা করেছে আরো একটি সত্তাকে সেটি হল মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব, তার পরিনাম ও পূর্বপুরুষের (প্রেতের) পূজা। প্রকৃতি উপাসনা, দেবতার কল্পনা, যাদুশক্তির প্রতি আস্থা, প্রেতের অস্তিত্বে প্রত্যয় ইত্যাদি বহুবিধ অলৌকিক চিন্তার মুখপাত হয়েছে ওই মান্যার ধারণা গড়ে ওঠার অনুষঙ্গে। সুতরাং বলা যেতে পারে জাদু এবং ধর্ম এই দুটি সংস্কারের আদিরূপ মান্যার মধ্যে নিহিত।[২]

প্রাচীন সমাজের কাছে নৈসর্গিক কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা ছিল না তাঁরা কল্পনা করতেন সবকিছুর আড়ালে লৌকিক ক্ষমতাশালী কোন শক্তির প্রভাব। এই ধারণা থেকে যাদু বিশ্বাস দেবীসত্তা এবং অনুরূপ নানা বিষয় বিশ্বাসই হল সমস্ত পূজা-পার্বণের অন্তর্নিহিত পরিচালিকা শক্তি। গাছ, ফুল, পাতা, অরণ্য, নদীর, বাতাস, জল, আগুন, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি নিসর্গের ভিন্ন বস্তুর মধ্যে দৈবীক শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়েছে। এরাই হল দেবতা এবং এদের কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছে ধর্মাচার, এর বিবর্তিত রূপই হলে পূজা-পার্বণ। পশু, পাখি, সরীসৃপ ইত্যাদিকে পূর্বপুরুষের প্রতিকী রূপে কল্পনা করা হয়েছে ও তাদের নিয়ে নানা পূজা পাঠের প্রচলন শুরু হয়। আত্মস্বার্থে, আত্মরক্ষার জন্য সেই ধর্মধারাকে অক্ষুন্ন রাখতে অলৌকিক শক্তির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হয়ে থাকে।

পরবর্তী কৃষ্টির আবির্ভাবের ফলে শ্রেণী সমাজের সৃষ্টি হল। সমাজের ভাগ্যনিয়ন্তা গোষ্ঠী শ্রেণী স্বার্থের সংরক্ষণের জন্য নানা প্রকার শাস্ত্র তৈরি করতে শুরু করে, যাদের অন্তর্কাঠামো লোকায়ত উৎসজাত হলেও বহির্কাঠামো উঁচু তলার নিজস্ব প্রয়োজনের স্বার্থে সৃষ্ট। সমাজ সংস্কৃতি বিবর্তনের সব ক্ষেত্রেই যে অবিচ্ছিন্ন চক্রপ্রবাহ সর্বদা সক্রিয় থাকে, এই ক্ষেত্রেও স্বাস্থ্যবিধানের কিছু অনিবার্য নিয়ম লোকায়ত পূজা পার্বণ দেবতা ইত্যাদির উপর আরোপিত হতে থাকে। আদিম কাল থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে যে সকল দেবতার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, আদিম - প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ-আধুনিক যুগ পর্যন্ত ধর্মের এবং ধর্মাচারের বিকাশে সমাজ মানসের দ্বান্দিক চক্রধারায় বাহিত হয়ে বর্তমান রূপগুলি তৈরি হয়েছে।[৩]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 56
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 474 - 481
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মধ্যযুগে রূপান্তরের সূত্রে দেবকুলে সমন্বয় প্রচেষ্টা নেপথ্য কারণ :

মধ্যযুগের ভারতবর্ষে ধর্ম সাধনার বিভিন্ন পর্যায়ে নানান ধরনের মানবতা বোধের অনিষ্ঠ একটা সমন্বয়ের অভিব্যক্তি ঘটেছিল। দ্বাদশ শতকে তুর্কি আক্রমণ ও মুসলমান শাসনের মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগের সূত্রপাত ঘটে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মঙ্গলকাব্য। মঙ্গল কাব্যের দেব-দেবীদের মধ্যে অনেকেই আর্য পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত নন, বরং গ্রামবাংলার উন্মুক্ত পরিবেশে ও সমাজে এদের উদ্ভব হয়েছে। তাই এই সকল দেব-দেবীরা লৌকিক গ্রামীণ আদর্শ থেকে উদ্ভূত। বাংলায় আর্য সংস্কৃতি ও দেব-দেবী তত্ত্ব দৃঢ়মূল হওয়ার আগে অস্ট্রিক গোত্র সম্ভুত আর্যেতর জাতির বসবাস ছিল। পরে আর্য হওয়ার পর প্রাচীন বাঙালি আর্য শিক্ষা সংস্কৃতিতে দীক্ষিত হল। তারা আর্য গোষ্ঠী ভুক্ত দেবদেবীকে নিজেদের উপাস্য দেবতা হিসেবে গ্রহণ করলো বটে, কিন্তু সমাজে নিম্নস্তরে অনার্য প্রভাবজাত দেবদেবী পূজার সংস্কৃতি বহাল ছিল। বাংলার পল্লী অঞ্চলে তাই গাছতলায় ফাঁকা মাঠে পুকুর পাড়ে ইত্যাদি জায়গায় বহু লৌকিক দেবতারা মহিলাকর্তৃক পূজিতা হতেন, এ সকল দেবতাদের কেউই শাস্ত্রসম্মতভাবে সংস্কৃত মন্ত্র দ্বারা উপাস্য নন। পুরান গ্রন্থে এঁদের উল্লেখ নেই।

কথায় আছে - 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর', কিছু বিষয় বিশ্বাসের উপর ভর করে টিকে থাকে। প্রাচীন আদিম সমাজ সভ্যতা থেকে বিশ্বাসের জোরে বজায় রেখেছিলেন বহু প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে। তাঁরা মনে করতেন কোন অলৌকিক সত্তার জন্য নানা বিপদ-আপদ থেকে তাঁরা রক্ষা পাচ্ছেন। ফলে সমাজ বিবর্তনেও সেই চিন্তা-চেতনার কোন পরিবর্তন ঘটেনি, মানুষ বিপদে পড়লে সেই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন সেটা ভয় থেকেই হোক বা ভক্তি থেকেই হোক! মানুষকে হিংস্র শ্বাপদের হাত থেকে বাঁচার জন্য চন্ডী দেবীর আবির্ভাব ঘটেছে, সাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য দেবী মনসার উৎপত্তি হয়েছে, বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ দক্ষিণরায়ের শরণাপন্ন হয়েছে, এমনকি বসন্ত রোগের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য মা শীতলার পূজা করা হয়েছে। এ সকল মধ্যযুগীয় দেব-দেবীরা ছড়া, পাঁচালী, মেয়েলী ব্রতকথায় আত্ম প্রতিষ্ঠা করে মেয়েদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। এভাবেই দেবী চণ্ডী, মনসা, শীতলা, ধর্ম, পঞ্চানন, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি লৌকিক বা গ্রাম্য দেব-দেবী বাঙালির আর্যেতর সংস্কার বহন করছে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলায় তুর্কি আক্রমণ শুরু হয় এরপর থেকেই দেশে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলতা ও শিক্ষা দীক্ষার মান ধুলিসাৎ হয়ে পড়ে। ফলত সেন বংশের সময় দেশে ধর্মের প্রতি কুসংস্কার ও যুক্তিহীন নিয়মকানুন গড়ে ওঠে, যেমন - কৌলিন্য প্রথা, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি। যদিও এই সকল নিয়ম উচ্চবর্ণীয় অভিজাতদের বানানো। শিক্ষা, শাস্ত্র, সাহিত্য সমস্ত কিছু বরাদ্দ ছিল উচ্চবর্ণীয়দের জন্য। অবহেলিত ও নিপীড়িত নিম্নবর্ণের মানুষদের সবকিছু থেকে বঞ্চিত করা হত এমনকি তাদের 'ছোটজাত' বলে অপমান করা হত। তাই ক্রমে নিচুতলার মানুষ ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়, সৌভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্যভাবের কারণে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে। নিম্ন বর্ণীয় হিন্দুরা তাদের পিতৃপুরুষের পূর্বতন প্রত্যয়ের নানা স্মৃতিকে বজায় রেখেই এই নতুন ধর্মের পরিমণ্ডলে প্রবেশ করেছিল।

বাংলায় তুর্কি অধিগ্রহণের ফলে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতায় মানুষের মনে এমনিই শান্তি ছিল না, তার ওপর অন্তজ্য শ্রেণীর মানুষেরা ক্রমে ধর্মত্যাগী হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় মধ্যযুগের রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে সমন্বয়ের অভিপ্রায় অনিবার্য হয়ে উঠল নিজেদের আত্মরক্ষা ও অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে। হিন্দু সমাজে যে অন্তর্লীন বর্ণগত দ্বন্দ্বের কারণে সামাজিক ভাঙন দেখা দিয়েছিল,তা অবিলম্বে রোধ করার জন্য নিচু তলার মানুষের উপাস্য দেবদেবী, ধর্মাচার ও বিশ্বাসকে দায়ে পড়ে সামাজিক স্বীকৃতি দিলেন উচ্চবর্ণীয় সমাজপতিরা। শ্রেণি, বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বাস ও ধর্ম এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয় যা মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করতে পারে তাই উচ্চবর্ণীয়রা অতি চাতুর্যসহ অন্তজ্য শ্রেণীর দেবতাকেন্দ্রিক বিশ্বাসকে আগে মান্যতা দিয়েছিলেন। ফলত কুল দেবতা, শাস্ত্রীয় লোকদেবতাদের উদ্ভব ঘটে ও তাদের মাহাত্ম্যের বিস্তার হয়।

সামাজিক জনজীবনে সুফি মতাবলম্বী ধর্ম সাধকরা অলক্ষ্যে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল ততদিনে। সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মে অনুপ্রাণিত মধ্যযুগের বাঙালি হিন্দুও নিজেদের অজ্ঞাতেই হয়তো ভাবাদর্শের মিল থাকার জন্য সুফিবাদের প্রতি উদার হয়েছিলেন। সুতরাং ধর্মের ক্ষেত্রে ভাব মিশ্রণের একটা পটভূমি গড়ে ওঠে। এরই পরিণতিতে তৈরি হল হিন্দু-মুসলিমের যৌথ আদর্শের উপর ভিত্তি করে নতুন ধরনের কালট্ : বাউল। মধ্যযুগের ধর্ম সমন্বয় সাধনের এই বাউল, ফকির, দরবেশ এরাই স্বাক্ষর বহন করছে। আধ্যাত্মিক চেতনা প্রচারের পাশাপাশি গোঁড়া হিন্দুদের মতো এরাও সম্প্রদায়িক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 56
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 474 - 481
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিদ্বেষ প্রচার করতেন, ফলে সামাজিক গতভাবে একটা জাতি বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় ও এর প্রভাব পড়ে লৌকিক দেবদেবীর উপর। লোকায়ত দেবদেবীর প্রচলিত কিংবদন্তির মধ্যেই তৎকালীন সমাজ চিত্রের উদাহরণ পাওয়া যায়। তবে মধ্যযুগের শেষের দিকে সাম্প্রদায়িক দন্দ সমন্বয় বাঙালি সমাজে এক দোটানার সৃষ্টি করেছিল, হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে সমতা বা সাক্ষতা হতে হতেও হয়নি, সমন্বয়ের স্বরূপ সন্ধান করতে গেলে এ বিষয়ে দৃষ্টি এড়িয়ে গেলে চলবে না।[৪]

দক্ষিনবঙ্গে এরকমই একজন লৌকিক দেবী হলেন বনবিবি, যিনি আনুমানিক বলা যেতে পারে মধ্যযুগের সময়কাল থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন এবং বর্তমানেও সুন্দরবন অধ্যুষিত অঞ্চলের তিনিই উপাস্য দেবী। এই দেবীর একটি রূপ প্রচলিত বাঙালি হিন্দু মাতৃকা দেবীর বিশেষ মূর্তি হিসাবে গণ্য হয়; অপর একটি অভিজাত বংশের মুসলিম কিশোরী মূর্তি বেশে পুজিত হন। দেবী দুই রুপেই হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই আরাধ্য। ফলত দেবীর বহিরাঙ্গিক রূপ যেখানে গৌণ, সেখানে একটা সমন্বয় বোধের চিন্তা-চেতনা ঐ ক্ষেত্রে মুখ্য হয়ে উঠেছে মধ্যযুগ থেকেই। মাওলেরা মধু সংগ্রহের সময়, বাওলেরা কাঠ কাঠতে যাওয়ার সময়, জেলেরা গভীর অরণ্যে মাছ, কাঁকড়া আহরন করতে বনের মধ্যে প্রবেশের আগে বনবিবির উদ্দেশ্যে; 'মা বনবিবি তোমার বাল্লক এল বনে/ এই কথাটি থাকে যেন মনে' - এই মন্ত্রটি পাঠ করে তবে বনে ঢুকতে হত সেই সময় থেকেই। যদিও মুসলিম ধর্মে মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ হলেও এক্ষেত্রে কোন ধমীয় দ্বন্দ্ব সেযুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত দেখা যায়নি। এরূপ সমন্বয় চেতনার অন্তরালে অবশ্যই একটি সামাজিক দ্বন্দ্ব পূর্ব উপাখ্যান রয়েছে; দক্ষিনরায়ের ও তাঁর মা নারায়ণীর সঙ্গে বনবিবির লড়াই কিংবা বনবিবির ভাই শাজাঙ্গুলির সঙ্গে দক্ষিনরায়ের বিবাদের কাহিনীগুলি সই পাতানো বা বন্ধুপ্রীতি অথবা ভাই দরদি দিয়ে শেষ হয়েছে; এই কাহিনীতে মূলত দ্বন্দ্বের সুত্রপাত ঘটে এলাকা দখলের অধিকার নিয়ে, কোন ধর্মের ভেদাভেদ জনিত কারনে বিবাদের সৃষ্টি হয়নি। তাই বনবিবি কালট আঠারোভাটির জনজাতিকে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একছত্রে বেঁধে রেখেছে, সেখানে অসহিষ্ণুতার কোন চারাই পারথেনিয়াম ঝড়ের মত ব্যাপকভাবে মাথা চারাদিয়ে উঠতে পারেনি।[৫]

বর্নাশ্রমকেন্দ্রিক হিন্দু ধর্মে সনাতনী দেবকূলের পাশে লৌকিক দেবদেবীর উদ্ভব :

তুর্কি অধিগ্রহণের পর হিন্দু-মুসলিম ধর্মের সমন্বয় গড়ে উঠল বাংলায়, তার ফলে লৌকিক দেবদেবীদের আর্যীকরণ করে 'জাতে' তোলা হল হিন্দু সমাজপতিদের আত্মরক্ষার তাগিদে। অথচ এই সকল দেবতারাই একসময় ছিলেন আদিতে আর্যত্বর সংস্কার ও অহংকারী হিন্দুদের সংস্কার বহির্ভূত। সময়ের বিবর্তনে বর্ণহিন্দুরা আত্মঅহমিকা ভুলে জাতি-ধর্ম রক্ষার তাগিদে নিম্নবর্গদের উপাস্য দেবতাদের স্বীকৃতি দিয়ে অন্ত্যজ শ্রেণীর সন্তুষ্টি ঘটিয়ে হিন্দু সমাজের ভিতকে দৃঢ় করতে বদ্ধপরিকর হলেন পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে। হঠাৎ স্বীকৃতি পাওয়া লৌকিক দেবতারা হলেন - চন্ডী, মনসা, ধর্ম ঠাকুর।

দেবী চন্ডীর উদ্ভব : ওঁরাও জাতি গোষ্ঠীর গোধিকা টোটেম (অর্থাৎ কুলো প্রতিকী পশু) সম্পন্ন সমাজের উপাস্য চান্দি দেবীর সঙ্গে আদিম মাতৃকা উপাসনার প্রতি ঘট পূজার রীতি সম্পৃক্ত থাকলেও থাকতে হতে পারে। যদিও পৌরাণিক চন্ডিকার সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকলেও নাম সাদৃশ হওয়ার জন্য তুর্কি আক্রমণোত্তর কালে হিন্দু বাঙালি সমাজে দেবী মঙ্গলচন্ডীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। ইনি শিকারিদেরই প্রধানত দেবী তা কালকেতু উপাখ্যানের মাধ্যমে দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচারের গল্পেতেই প্রতীত হয়।

অপরদিকে দ্রাবিড় যুগে সর্পের দেবীর মনচাম্মার উল্লেখ পাওয়া যায়, যার বৃক্ষ প্রতীক ছিল চেমুণ্ডু অর্থাৎ ক্যাকটাস জাতীয় গাছ। তাই তদানীন্তন সমাজে মনসাম্মা দেবীর রূপান্তরিত রূপ মনসায় পরিণত হল এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর কাছে সর্পভয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মনসা দেবীরূপে খাতির যত্ন পেতে লাগলেন।

বাংলার বহু লৌকিক দেবতারাই দ্রাবিড় বলয়ের লৌকিক দেবদেবীদের সঙ্গে সাদৃশ্য সূচক। কুট্টনদেব, থিরুবয়অর, মারি আম্মা, সপ্তকানিঙ্গেস, আনিকাম্মা প্রভৃতি দেবদেবীরা বাংলার বহু লৌকিক দেবদেবী যথা - বারা ঠাকুর, পঞ্চানন্দ, সাতবিবি, ওলাইচণ্ডী প্রমুখের সাথে সাদৃশ্য সূচক। তাই উচ্চবৃত্তি ও বর্ণ হিন্দুদের কাছে চেম্মুন্ডু চ্যাংমুড়ি হয়ে 'জাতে' উঠলেন সমাজের কাছে; চাঁদ সওদাগরের গল্প তারই প্রতীক। বেহুলার দেব সভায় নৃত্য করার প্রচলন বাংলার সংস্কৃতিতে প্রায়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 56
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 474 - 481
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অপ্রাপ্য ছিল - এই দৃশ্যাবলী নিঃসন্দেহে যে দক্ষিণের দেবদাসী নৃত্যের আদলে কল্পিত অবকাশ রাখেনা। ব্রাত্য বলে গণ্য লৌকিক দেবতারা সমাজে সকল স্তরে স্বীকৃত হল এভাবেই।

শিব আদিতে হরপ্পা সংস্কৃতিতে পুজিত প্রাগার্য দেবতা রূপে পূজিত হতেন ঠিকই, কালক্রমে ইন্দ্র, সূর্য, বরুণ, মিত্র প্রভৃতি বিখ্যাত দেবতাদের পিছনে ফেলে শিব হয়ে উঠলেন দেবাদিদেব মহাদেব। চান্দির রুপান্তর চন্ডি দেবী হয়ে উঠলেন শিবের পত্নী এবং সেই সঙ্গে দেবী মনসা কোচ নারীর মেয়ে হয়েও শিব নন্দিনী হয়ে উঠলেন, যদিও উচ্চবৃত্তীয় শ্রেণীরা মনসাকে দেবী বললেও অবৈধ সন্তান হওয়ার অপবাদ থেকে রেহাই দেয়নি। ফলত শ্রেণীর সমাজের মধ্যে সমন্বয় ঘটলেও তার সহজাত দ্বান্দ্বিক চরিত্রের আকর্ষণ-বিকর্ষনেই ঘটেছে সে কথা বুঝতে পারা যায়। একইরকম ভাবে ডোমজাতির উপাস্য দেবতা ধর্ম ঠাকুর এলেন... হিন্দুদের দেবকূলে তিনি শিবে একটি রূপের মাহাত্ম্য নিয়ে জায়গা করে নিলেন উচুতলায় হিন্দুদের কাছে। সেই সঙ্গেই যুক্ত হল সূর্য, যম, বুদ্ধ প্রমুখ এবং সাপ, কচ্ছপ, কুমির, কাঁকড়া বিছের টোটেম বা পাথর পূজা আদিম সংস্কারগুলিও। এই সমন্বয় প্রবণতা সমাজমানসে আদিস্তর থেকে নিহিত ছিল। আদিম যুগের অন্ধসংস্কারগুলি মধ্যযুগ অতিক্রম করে এভাবেই আধুনিক স্তরে এসেও পৌঁছেছে।[৬]

লৌকিক দেব-দেবীদের প্রতিষ্ঠার সামাজিক, অর্থনৈতিক কারণ অনুসন্ধান :

দ্বাদশ শতকের পর থেকে হিন্দু সমাজের অন্তর্লীন সমন্বয় গঠনের পর অন্ত্যজ শ্রেণীর উপাস্য দেবতারা 'জাতে' উঠে গেলেন। লৌকিক দেবতাদের সাথে শাস্ত্রীয় দেবতারও সংমিশ্রণ ঘটল শ্রেণিবিভক্ত সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে। ফলত লোকায়ত দেবতারা সমাজের সকল স্তরে প্রতিষ্ঠিত হল। আদিম নিঃসর্গ উপাসনা চন্দ্রকে কেন্দ্র করে আজও বহমান। সনাতনী সূর্য পূজার ধারায় বলা হয় 'তৎসবিতুর্বরেন্য ভর্গো দেবস্য ধীয়ো যো ন প্রচোদয়াৎ' এবং অন্যদিকে লৌকিক ক্ষেত্রে বলা হয়, 'ওঠো ওঠো সূর্যাই রে ঝিকিমিকি দিয়া/ তোমারে পূজিব আমি বনফুল দিয়া' - ব্রতের এই সকল ছড়া গানের মধ্যে সূর্যের বন্দনাই করা হয়। বজ্রপাতের সময় শঙ্খ ধ্বনি দেওয়া লৌকিক আচার অন্যতম বিশ্বাস। তবে শাস্ত্র মতে, বজ্রের দেবতা তথা ইন্দ্রকে তুষ্টি সাধনের নিমিত্ত পালনীয় মাধ্যম। হিন্দুমতে বিয়ের সময় অগ্নিদেবতাকে লাজাঞ্জলি দেওয়ার প্রথাটা কিন্তু আগুনের দেবতাকে পূজার আদিম রীতি থেকে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আবার ধানের গুছিকে মা লক্ষ্মীর প্রতীক হিসেবে পূজা করা হয়। এই ধরনের পূজার রীতি আদিম সংস্কার সঞ্জাত যা শস্য উপাসনাকে চিহ্নিত করে। পশুপূজার উদ্দীপনা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও তা রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য, এছাড়া গো মাতার বন্দনা ও হনুমান মন্দির প্রতিষ্ঠার বাড়বাড়ন্ত দেখে তা বোঝা যায়। মনসা উপাসনা বা গণেশ বন্দনা ও একইভাবে 'থেরিওমর্ফ' দেবতাদের সঙ্গে 'জুমর্ফ' দেবতাদের নতুন প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। বস্তুতপক্ষে আদিম কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত সময়ের ব্যবধানে, মানুষের বিশ্বাসে ও সংস্কারে দেবতা সম্পর্কে ভাবনা একই আছে কেবল বহিরাঙ্গিক রূপান্তর ঘটেছে মাত্র।

প্রাগৈতিহাসিক প্রপিতমহদের সময় থেকে অর্জিত দেব-কল্পনা পরবর্তীকালের মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করেছে। লৌকিক দেবতা তথা আঞ্চলিক ও অশাস্ত্রীয় দেবতাদের সম্পর্কেও মানুষের কল্পনার সীমা কেবলমাত্র নিজেদের প্রয়োজনে গন্ডি পর্যন্তই সীমিত। লৌকিক দেব দেবীরা আমাদের সাংস্কৃতিক বলয়ে শিব-শক্তির রকমফের বলেই গণ্য হন। আধুনিক লোকায়ত কিছু দেবতা ছাড়া অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীরা আদিম সংস্কারের ধারাকে অনুবর্তন করেই বঙ্গভূমিতে গড়ে উঠেছিল মধ্যযুগে... সেকথার সাক্ষ্য দেয় ইতিহাসের পাতা। এরা সৃষ্ট হয়েছিল হিন্দু সমাজের আয়তনের নিচের তলায় ঠেলে রাখা অর্থ-সামাজিক শ্রেণীর ভিতরে। উচ্চবর্ণীয়রা যে সকল দেবতার উপাসনা করতেন তাদেরকে শাস্ত্রীয় তকমা দেওয়া হতো। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটার প্রক্রিয়ায় হল লৌকিক দেবতাদের সংস্কৃতায়ন, বা বলা যেতে পারে 'জাতে তোলা'। বাঙালি সমাজ জীবনে পূজা-পার্বণ এক অদৃশ্য সূত্রে বাঁধা যুগ যুগান্তর ব্যাপী সংস্কৃতি। আমাদের প্রাচীন প্রপিতামহদের সময়কাল থেকে পূজা অর্চনার এক বিশেষ রীতিনীতি পরিলক্ষিত হয়; তারই সূত্রে সময়ের পলি এই সকল রীতিনীতি উপর জমেছে যুগ বিবর্তনের সাথে। তাই বহু ক্ষেত্রেই প্রাথমিক অনুষঙ্গ গুলি হয় আমরা ভুলে গিয়েছি- শুধুমাত্র চিন্তাহীন অভ্যস্ততায় সেগুলি পালন করে আসছি বা নিজস্ব মতামত ও সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে মূল কারণটাকেই আবৃত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 56
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 474 - 481
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

করে ফেলেছি; প্রায়শই সেটা না বুঝে, না ভেবে! আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর রূপ বদল হওয়ার প্রেক্ষিতে শুধুমাত্র তাদের তাৎপর্যগুলির গোত্রান্তর ঘটেছে মাত্র।

বস্তুতপক্ষে, বহু প্রাচীন লৌকিক দেবদেবীদের বর্তমান সমাজে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, যার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো সম্প্রদায়িক ভাবনা। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুরা যাকে সত্য নারায়ণ জ্ঞানে পূজা করছেন, মুসলিমরা তাকেই দরগায় সত্যপীরবাবা রূপে দোয়া করছেন। উভয়ে জায়গায় ঘোড়া মানসিক করা হয় ও নৈবেদ্য রূপে শিরুনী (সিন্নি) প্রসাদ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক বিভেদের ফলে নামের পরিবর্তন হয়েছে, পার্থিব চাহিদা বা প্রার্থনার তাগিদ একই রয়েছে।[৭]

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুপ্রাচীন লৌকিক দেবতা দক্ষিণ রায় ব্যাঘ্র দেবতা হিসেবে প্রাচীনকালে মাহাত্ম্য প্রকাশ করেছিলেন। কালক্রমে তাঁর বিবর্তন ঘটেছে। গভীর অরণ্যে ঘেরা সুন্দরবন বনাঞ্চল বাঘের ডেরা হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ ছিল, মানুষ গভীর অরণ্যে কাঠ, মধু সংগ্রহ করতে গেলে বাঘের হাতে প্রাণ হারাতো বলে দক্ষিণ রায়ের পূজার প্রচলন ঘাটে। বর্তমানে বারইপুর সংলগ্ন এলাকা ধপধপী মন্দিরে দক্ষিণরায় পূজিত হন মহা সমারহে এবং সেখানে তিনি যতখানি না ব্যাঘ্র দেবতার রূপে বিরাজমান তার থেকেও অনেক বেশি সন্তান কামনা ও সংসারের মঙ্গলার্থে, নানান রোগ ব্যাধি নাশ, মামলা মকদ্দমা, পরীক্ষায় ভালো ফলের আশায়, চাকরি পাওয়ার আশায় ইত্যাদি মানব স্বরূপ ওরা মানসিক করা হয়। ফলে তো এই যে পরিবর্তনের ধারা কিন্তু অর্থ সামাজিক প্রেক্ষিতেই ঘটেছে বলাবাহুল্য।[৮]

প্রাচীন প্রপিতামহদের ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে অক্ষুন্ন রেখে লৌকিক দেব-দেবীর পূজার্চনা চলে আসছে বা মানুষ ঐশ্বরিক সত্তার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করছে তা নয়, এই সকল দেব-দেবী বাঙালির আবেগ ও অনুভূতির সঙ্গে জড়িত। বর্তমান আধুনিক সমাজনীতির প্রেক্ষিতে যদি দৃষ্টি আরোপ করা যায় তবে দেখা যাবে অতীতের অধিকাংশ লৌকিক পূজাই আজ বিলুপ্তির পথে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বপুরুষদের তৈরি করার নিয়ম তাদের আচার অনুষ্ঠান বংশ পরম্পরায় ক্রমবর্ধমান হলেও তার বদল ঘটেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার রূপ বদলের ফলে মানুষের হাতে সময়ের মূল্য অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ; ফলত পূজার্চনা ও তার নিয়মকানুন, সংস্কার পালনের সামঞ্জস্য রেখে নিয়মের ব্যবধান কমিয়ে এনে শুধুমাত্র নিয়ম টুকু রক্ষা করাই বর্তমানে যুগের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সকল পূজার পিছনে গড়ে ওঠা মূল বক্তব্য বা মূল ভিত্তি, সকল কিছুই অতীতের খামে বন্দি হয়ে গিয়েছে। পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য সমস্তটাই যুগের সাথে ক্রম বর্ধমান হলেও বর্তমান সমাজে তার রূপান্তর ঘটেছে তা বলাবাহুল্য। আধুনিক সমাজে যে সকল দেবদেবী বৃক্ষতলায় বা মাঠের প্রান্তে পূজিত হত, তা বর্তমানে মন্দিরে রূপান্তর ঘটেছে বা বলা যেতে পারে দেবতার স্থানান্তর ঘটেছে; এমনকি দেবমূর্তি পরিবর্তন ও মহিমার বদলও ঘটেছে কালক্রমে। এই রূপান্তরের আড়ালে মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে শিক্ষিত সমাজের মনন ও ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন।

দেবতা সকল সম্প্রদায়ের কাছে শান্তির প্রতীক তথা ক্ষেত্র। সৃজনশীল মানুষ চায় তাদের বাসস্থানসহ ব্যবহৃত সমস্ত জিনিস সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে। নিত্য নতুন সৃষ্টিশীল কার্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে দেবত্বস্থান, তাঁদের রূপসজ্জা, গঠনাকৃতি, রীতিনীতি, মন্ত্রাদি এমনকি পুষ্পসজ্জারও ভিন্নতা লক্ষণীয়। ফলত বহিরঙ্গের এতকিছু কার্যাদি কেবল চোখের আরাম বা মানসিক শান্তির উদ্দেশ্য মাত্র এ ছাড়া আর কিছুই নয়, বর্তমান সমাজের কাছে এই সকল আড়ম্বরগুলি 'নিয়ম-সংস্কার' হিসেবে পরিণত হয়েছে। তবে উদ্দেশ্য তো একটাই পার্থিব চাহিদা, ঈশ্বরের কাছে কাঙ্খিত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা পূরণের কামনা সেই একই থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লাইনটি মনে পড়ে যায় - 'আপন মনের মাধুরী মিশায়/ তোমারে করেছি রচনা'।।

Reference:

১. সেনগুপ্ত, পল্লব, 'পূজা পার্বণের উৎসকথা', পুস্তক বিপণী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৯, পৃ. ১৭
২. সেনগুপ্ত, পল্লব, 'পূজা পার্বণের উৎসকথা', পুস্তক বিপণী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৯, পৃ. ২১

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 56
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 474 - 481
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৩. সেনগুপ্ত, পল্লব, 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', পুস্তক বিপণী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৯, পৃ. ৫২
৪. সেনগুপ্ত, পল্লব, 'পূজা পার্বণের উৎসকথা', পুস্তক বিপণী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৯, পৃ. ৭১
৫. বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, 'বাংলার লৌকিক দেবতা', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, পৃ. ২৯
৬. সেনগুপ্ত, পল্লব, 'পূজা পার্বণের উৎসকথা', পুস্তক বিপণী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৯, পৃ. ৭৫
৭. সেনগুপ্ত, পল্লব, 'পূজা পার্বণের উৎসকথা', পুস্তক বিপণী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৯, পৃ. ৩০
৮. ঘোষ, সঞ্জয়, 'সুন্দরবনের পূর্বপুরুষ পূজা (একটি সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের বিশ্লেষণ)', প্যারালাল প্রেস, ২৮/৩/সি ঊর্মিলা কমপ্লেক্স (দ্বিতল), ঠাকুরপাড়া রোড, জয়নগর মজিলপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৩৩৭, পৃ. ১০৪